বাংলাভাষী বাঙালিদের কাছে
আমার কয়েকটা প্রশ্ন

পুষ্কর দাশগুপ্ত

প্রশ্ন ১.

বাঙালি কাকে বলব, কে বা কারা বাঙালি? অল্পবিদ্য, স্বল্পবুদ্ধি আমি আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় যা বুঝি তা হল ভাষা-পরিচয়ে অর্থাৎ মাতৃভাষা বা প্রথম শেখা ভাষার পরিচয়ে বাঙালি বাঙালি, ইংরেজ ইংরেজ। ভৌগোলিক পরিচয়টা গৌণ, যেমন, আসামে অনেক বাঙালি রয়েছেন অথবা কলকাতায় বহু অবাঙালি বাস করেন। প্রশ্ন হল, ইংরেজি জানে না এমন কাউকে কি ইংরেজ বলা যায় বা বলা হয় ? বাংলা যে জানে না আর জানতেও চায় না, তাকে কি বাঙালি বলা যাবে?

প্রশ্ন ২.

'শিক্ষিত' বাঙালি কে বা কারা ? ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় কয়েকটা পাশ দেওয়া অর্থাৎ কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী বাঙালিকে বলা হয় 'শিক্ষিত' বাঙালি। অথচ ধ্রুপদী আরবি আর ফার্সি অথবা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য অধিকার রয়েছে এরকম দুজন বাঙালিকে 'শিক্ষিত' বলা হয় না। 'শিক্ষিত' বাঙালিরা অবজ্ঞার বাঁকা হাসি মিশিয়ে প্রথম জনকে বলবেন মৌলবি সাহেব, দ্বিতীয় জনকে পণ্ডিতমশাই। এর কারণ বা যুক্তিটা কী?

প্রশ্ন ৩.

আনন্দবাজার পত্রিকার বৈদ্যুতিন সংস্করণে 'আমাদের কথা' নামে আত্মপরিচিতিতে এই দৈনিক পত্রিকার পাঠকদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মর্যাদার উচ্চস্তর বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে, এঁরা হলেন 'কলকাতা থেকে নিয়মিত বিমানে ভ্রমণকারী প্রতি দু'জনের একজন, পশ্চিমবঙ্গে নামকরা গাড়ির মালিকদের ৪০%, রাজ্যের ওয়াশিং মেশিন আছে, এমন মানুষদের অর্ধেকেরও বেশি, পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক মাইক্রোওয়েভ মালিক, রাজ্যের সমস্ত এয়ার কন্ডিশন মালিকের ৪০%' । এতে যোগ করা হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা 'সংবাদপত্র নয়, এক বৃহৎ বাজার'। এই বড়া বাজার আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলাভাষার পত্রিকা হয়েও বাংলাভাষার ব্যবহারের বিস্তারের চরম বিরোধী আর মাতৃভাষা বাংলার পক্ষপাতীদের 'বাংলাবাজ' বলে নির্দেশ করে।

যে ভাষার পত্রিকা সেই ভাষারই চূড়ান্ত বিরোধী বাংলাভাষার আনন্দবাজার পত্রিকা ছাড়া এরকম আর কোনো একটি পত্রিকা পৃথিবীতে আছে কী? যদি না থাকে তাহলে বাংলা ভাষার সংবাদপত্র 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' পৃথিবীর একমাত্র দৈনিক পত্রিকা যা যে ভাষায় প্রকাশিত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য কি কর্মক্ষেত্রে সে ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহারের বিস্তার আর সে ভাষা সর্ব স্তরে শিক্ষা, বিদ্যা এবং জ্ঞানচর্চার ভাষা হয়ে উঠুক তার একান্ত বিরোধী । গিনেস বুকে এই ব্যাপারটা এখনো স্থান পায়নি। 'শিক্ষিত' বাঙালিদের কী গিনেস বুকের অপদার্থ কর্মী আর কর্তৃপক্ষকে এই অনন্যসাধারণ ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত করানো উচিত নয়?

প্রশ্ন ৪.

দেশের শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞনের চর্চা – সর্ব স্তরে, সর্ব ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বদলে বিদেশি কোনো ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে অথচ সে দেশের তথা দেশের সংখ্যগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক, স্থিতিশীল ও সর্বঙ্গীন উন্নতি হয়েছে – সারা পৃথিবীতে এরকম কোনো দেশ আছে কি? থাকলে সেই দেশ বা দেশগুলির নাম কী?

প্রশ্ন ৫.

ইংরেজি শিক্ষার গত দুশ বছরের ইতিহাসে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, মানবিক-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় 'শিক্ষিত'বাঙালির/ভারতীয়দের মৌলিক অবদান কতটা? যদি সেরকম কোনো অবদান না থাকে তাহলে তার কারণটাই বা কী?

প্রশ্ন ৬.

সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে অনড় এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা দেশে ইংরেজি জানা না জানার মাপকাঠিতে পুরনো জাতিভেদের চেয়ে আরো দৃঢ়মূল নতুন জাতিভেদ গড়ে তুলেছে। টমাস ব্যাবিংটন মেকলে-র জারজ (মেকলের ভাষায়, 'a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect'/রক্তের পরিচয়ে ভারতীয়, অথচ রুচি, মতামত, নৈতিকতা আর বুদ্ধি-বিবেচনায় ইংরেজ এরকম এক শ্রেণীর লোক) বড়বাবু-বড়বিবিদের পোস্ট-কলোনিয়াল যুগের (? নিও-কলোনিয়াল বললে রাবিশ, রিডিক্যুলাস ইত্যাদি বলে সমাজের ক্রেম দ লা ক্রেম বাঙালিরা আমার মতো সিলি অ্যাস, নিটউইট, ইল্লিটারেটকে ইংরেজিতে তাড়া করবে !) এ দেশে ইংরেজি না জানলে তো বটেই, গটমট করে ইংরেজি না বললে কোনো অফিস-আদালতে, এমন কী বড়সড় দোকানপাট কি রেস্টোরেন্টে খদ্দের হিসেবেও পাত্তা পায় না। অবশ্য কলকাতা শহরও এখন আর বাঙালির – রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিতের কলকাতা নয়, এই পোস্ট-কলোনিয়াল (?) শহর এখন 'নর্দমার সাধ্বী' আলবেনীয় আনিয়েজ গইনজে বোজাজিয়ু ওরফে খ্রিস্টানদের ওপরওয়ালার আশীর্বাদ-ধন্যা টেরিজা-র 'নর্দমা' কলকাতায় পরিণত। যাই হোক, পোস্ট-কলোনিয়াল (?) নতুন জাত-বিচারে এদেশে বা কলকাতা শহরে এখন যারা একমাত্র 'ছোটলোকদের' অর্থাৎ ঝি-চাকর, ড্রাইভার, দারওয়ান, ছোটখাট দোকানদার আর বাজারের ওয়ালাদের বাদ দিয়ে সবার সঙ্গে সারাক্ষণ ইন্ডিয়ান ইংলিশে (তুলনীয়: বিলিতি আমড়া, দিশি হুইস্কি) কথা বলে (ইংরেজিতে অকথ্য বলে নটে ইত্যাদি শাক, সজনে ডাঁটা, পটলের দোলমা, ইলিশ মাছের পাতুরি, এঁচড়ের ডালনা বা কৈ-তেল খায় না) তারা হল বামুন, (আবার এদের মধ্যে যারা প্রচুর স্বরক্ষেপ সহ ইংরেজি বলে, ব্রিনজল না বলে এগপ্লান্ট বা obɛrʒin বলে, রুই-কাৎলার বদলে ইন্ডিয়ান কার্প্স্ বলে, প্লেজার, মেজার না বলে বলে pleʒ:ər, meʒ:ər, তারা হল কুলীন বামুন, – এর পরের স্তরে ইংরেজি বলা-কওয়ার কায়দা আর কেরামতির কমবেশিতে ওই বামুনদের মধ্যে আবার ভঙ্গ, অকুলীন যজমেনে, অগ্রদানী ইত্যাদি পর্যায় স্থির হয়।) ইংরেজি অল্পস্বল্প জানে, ঘষে ঘষে কোনোরকমে মাছিমারা কেরানির কাজ চালিয়ে যেতে পারে, ইংরেজি বলতে গেলে ঢোক গিলতে হয়, বুক ধরফর করে : এরা হল গিয়ে বদ্যি, কায়েত; তারপর জল-চল নবশাখ: ইংরেজিতে নাম-ঠিকানা, সন-তারিখ, পণ্যদ্রব্যের

কৌটোর ওপর ছাপানো নাম, ইংরেজি সাইনবোর্ড, পথ-নির্দেশ ইত্যাদি মোটামুটি পড়তে পারে। সব মিলিয়ে খুব বেশি হলেও দেশের মানুষের শতকরা পাঁচ জন। বাকি শতকরা পঁচানব্বই জন দেশের নাগরিক ইংরেজি জানে না, ইংরেজি বুঝতে, বলতে বা লিখতে পারে না, পোস্ট-কলোনিয়াল (?) নতুন জাত-বিচারে এরা জল-অচল নিচু জাত, অচ্ছুৎ। এই জাতিভেদ সম্পর্কে প্রগতিশীল 'শিক্ষিত' বাঙালিরা কী বলেন?

প্রশ্ন ৭.

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নিরক্ষরের এই দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন ইংরেজি না জানা নাগরিককে তথ্য জানার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার আর ভাষিক-সাংস্কৃতিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। তারা ইংরেজিতে লেখা আইন-কানুন থেকে আরম্ভ করে রাস্তায় লিখিত পথ-নির্দেশ, ওষুধের দোকান থেকে কেনা কোনো জীবনদায়ী ওষুধের নাম, ভেতরের নির্দেশ ও ব্যবহারবিধি, সতর্কবাণী বা ঐ ওষুধের ভেষজ-রাসায়ণিক উপাদানের বিবরণ; বাজারের কোনো মোড়কে ঢাকা ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের উপাদানগুলি কী, কবে তা তৈরি হয়েছে আর কতদিন অব্দি তা ভোগ বা ব্যবহার করা যাবে তা পড়তে পারে না – এসব তথ্যের কোনোটাই জানা, পড়ে বা শুনে বোঝার ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেই। দেশের নাগরিক হিসেবে এদের একমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার হল পাঁচ বছর অন্তর একবার ছোট, মাঝারি কি বড় নেতাদের মিথ্যে কথায় ঠাসা বুকনি আর বক্তিমে আর তাঁদের লুম্পেনবাহিনির হম্বিতম্বি শুনে ভয়ে-ভক্তিতে ভোটের কাগজে ছাপ্পা মেরে বাক্সে গুঁজে দেওয়া। তারপর আবার মুখ বুজে প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত পাঁচ বছর । এর পরও 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র' দেশের এই অভিধা কি হাস্যকর আর ব্যঙ্গার্থক মনে হয় না?

প্রশ্ন ৮.

ভাষার ভিত্তিতে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, বৈষম্য, বঞ্চনা আর শোষণ, ভাষার ক্ষমতা বা শক্তি ব্যবহার করে দমন-শাসন –এ বিষয়ে সাধারণভাবে 'শিক্ষিত' বাঙালিরা, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী – নরম, গরম, মধ্য, চরম ইত্যাদি যেকোনো পন্থী সাম্যবাদীরা, এমনকি বিপ্লবীরাও কখনো পরিষ্কারভাবে কিছু বলেন না, কেন? ঔপনিবেশিক শিক্ষার মানসিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে তাঁরাও কি এ অবস্থাটাকে স্বাভাবিক, চলছে চলবে বলে মনে করেন?

প্রশ্ন ৯.

ইংরেজি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের জের্মানিক-টিউটনিক অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাগোষ্ঠীর একটি ভাষা। এই ভাষা গ্রেকো-রোমান সভ্যতা আর জুডিও-খ্রিস্টান সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণায় পরিপোষিত। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের ভিন্নতর ভৌগোলিক পরিবেশ আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাস করা ভারতীয়দের/বাঙালির জীবনের বহু অপরিহার্য উপাদান বা ধ্যানধারণাকে (গাছপালা, শাক-সব্জি, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস, পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি) এ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বাঙালি/ভারতীয় শিশুকে/ব্যক্তিকে তার সমাজ তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা কিছু মাঝারি মানের অনুকরণ, অনুসরণ ও পুনরাবৃত্তিক্ষম 'শিক্ষিত' উৎপাদনেই শেষ হতে বাধ্য। ইংরেজি শিক্ষার গত দুশ বছরের

ইতিহাসে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, মানবিক-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা/এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ‘শিক্ষিত’ ভারতীয়দের অবদান কী বা কতখানি তা চিন্তা করলেই ব্যপারটা বোঝা যায় (দ্র. প্রশ্ন ৪.)। আমাদের প্রযুক্তিবিদরা ইংরেজি বইয়ে পড়া আর দেখা ছবি অনুসারে শীতের দেশের বাড়ির আদলে এদেশে এমন সব বাড়ি তৈরি করেন যেগুলিতে গ্রীষ্মমণ্ডলের মৌসুমী অঞ্চলে বাস করা যন্ত্রণাদায়ক। আমাদের সহস্রমারী চিকিৎসকদের বেশির ভাগ ইংরেজি বইপড়া হাতুড়ে। আমাদের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা বেশির ভাগ কারিগর, বিদেশিদের নির্দেশ আর ছক মেনে অর্ডারি সফ্টওয়ার বানিয়েই সন্তুষ্ট। আমাদের অধ্যাপকরা অমুক সাহেব আর তমুক সাহেবের মতামত মুখস্ত বলাটাই অধ্যাপনা বলে মনে করেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থা কী কখনো কাটবে না?

প্রশ্ন ১০.

চারদিকের জগৎ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিদেশি ভাষায় অধীত বিষয় শিক্ষার্থীর বোঝার স্তর পেরিয়ে বড় জোর মানসিকতার আপাত সংস্থানে পৌঁছোতে পারে, কিন্তু তা তার পরের স্তরে নিহিত সংস্থানে আত্তীকৃত হয়ে চিন্তাপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সৃজনশীল বা উদ্ভাবক সঞ্জননী ক্ষমতায় পরিণত হয় না। আমাদের এই উপলব্ধিটা কি আমাদের দেশ তথা ঔপনিবেশিত আরো কিছু দেশের তথাকথিত শিক্ষিতদের সম্পর্কে প্রযোজ্য বা যথার্থ নয় ?

প্রশ্ন ১১.

বিদেশি ভাষায় এই শিক্ষাব্যবস্থা কি শিক্ষিতদের এক ধরনের ভারসাম্যহীন দ্বৈত জীবন যাপনে (স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় ভুগতে) বাধ্য করে না ? বট-অশ্বত্থ আর নিম গাছে ঘেরা বাস্তবের ঘর আর ওক-এল্ম-অ্যাশ-এর ছায়ার স্বপ্ন দেখা বাইরের, জীবন-যাপন আর বাচনের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত অসুস্থ জীবন কি ব্যক্তি আর সমাজ-জীবনকে পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তোলে না ? এই পক্ষাঘাতের লক্ষণ আর উপসর্গ কি দেশের তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা আর কথাবার্তায় স্পষ্ট নয়?

প্রশ্ন ১২.

যে ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ হয় না, যে ভাষা আধুনিক নাগরিক জীবন আর তথ্যপ্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন আর তার ফলে নতুন শব্দের, নতুন বাগধারার উদ্ভাবন দ্বারা আধুনিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রেতভাবে যুক্ত হয় নি , যে ভাষায় কিছু গল্পকবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখা হয় না সে ভাষার ভবিষ্যৎ কী ? সে ভাষার আয়ু কতদিন? আর সে ভাষার সাহিত্যও কি গতিহীন গেঁজিয়ে ওঠা বদ্ধ জলায়, গল্প-কবিতা একঘেয়ে বিলাপ আর প্রলাপে পরিণত হয়ে ওঠে না ? বাংলা ভাষার অপুষ্টি আর রক্তশূন্যতার ভবিষ্যৎ পরিণাম কী?

প্রশ্ন ১৩.

আমরা অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার বিদেশি সাহিত্য পড়ি, পড়ে হৈচৈ করি: বোদলের, রিলকে, নেরুদা, মার্কেস... কিন্তু ইংরেজিতে অনূদিত হলেও বাংলা ভাষার লেখকদের (রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ , সামসুর রহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়...) লেখা বিদেশিদের কেউ পড়ে না বা তা নিয়ে আলোচনা

করে না। এর কারণ কী ?

প্রশ্ন ১৪.

বাংলা ভাষা আজও যথার্থ অর্থে কম্প্যুটারিয়িত হয় নি । তথ্যপ্রযুক্তির পরিভাষা নিয়ে কখনো মাথা ঘামানো হয়নি। বাংলায় কোনো পরিচালনা তন্ত্র (যেমন উইনডৌজ, ম্যাক ও এস, অ্যান্ড্রইড) নেই, কোনো পরিপূর্ণ সফ্টওয়ার সমষ্টি (যেমন মাইক্রোসফ্ট অফিস, ওপেন অফিস...) নেই , জোড়াতালি দিয়ে বাংলায় টাইপ করতে হয়রান হতে হয়। আরেক পদ্ধতি হল রোমান হরফে বাংলা – অদ্ভুত, অনেক ক্ষেত্রে তার পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব। কম্প্যুটারে প্রকাশনার জন্য পেজ মেকার বা ইন ডিজাইনে সরাসরি বাংলা ব্যবহার করা যায় না, কারিগরি পদ্ধতিতে তৈরি নিম্নমানের কিছু সফ্টওয়ারের সাহায্য নিতে হয়। প্রায়-কুটিরশিল্পের উৎপাদন ওই সফ্টওয়ারগুলির প্রযুক্তি সীমাবদ্ধ, তাতে আলাদা ইউনিকোডে টাইপ করা রচনা ব্যবহার করা যায় না, আবার এই সফ্টওয়ারের সাহায্যে টাইপ করা রচনা আলাদাভাবে বাইরে ব্যবহার করাও কঠিন। স্বয়ংক্রিয় বানান আর ব্যকরণ-সংশোধক না থাকায় ছাপার ভুল ছাড়া বাংলা বই দেখা যায় না। এসব নিয়ে সাধারণভাবে বাঙালি আর বিশেষভাবে বাংলাভাষার লেখক-সাংবাদিকরা কেন কখনো কিছু বলেন না, ভাবেন বলেও মনে হয় না। তাঁরা কি অন্যন্য অনেক ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও অদৃষ্টবাদী?

প্রশ্ন ১৫.

বাংলাভাষায় যথার্থ অর্থে কোনো অভিধান নেই। কোনো ভাষার সাধারণ অভিধানে (বিপ. বিশেষ অভিধান: দ্বিভাষিক, বৈজ্ঞানিক, আঞ্চলিক অভিধান ইত্যাদি) যা থাকে তা হল উপস্থাপিত শব্দগুলির:

ক. আন্তর্জাতিক ধ্বনিভিত্তিক বর্ণমালায় প্রতিবর্ণীকৃত (বৈদ্যুতিন সংস্করণে শোনার জন্য উচ্চারণের রেকর্ড সহ) মান উচ্চারণ;

খ. পদ-প্রকরণ (বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি) ;

গ. ১.ইতিহাস. শব্দটির উৎস ও ব্যুৎপত্তি ;

২. ভাষায় কোন সময় থেকে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে ;

ঘ. সংখ্যা (১, ২, ৩ ইত্যাদি) বা অন্য কোনো চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত শব্দটির ক্রমানুসারী বিভিন্ন (প্রচলিত বর্তমান থেকে অতীত, সাধারণ থেকে বিশেষ পারিভাষিক...) অর্থ বা সংজ্ঞার্থ – উক্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী শব্দটির প্রয়োগের (যথাসম্ভব সাহিত্য, সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকে) দৃষ্টান্ত;

ঙ. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাহিত্য বা/এবং প্রবচনে বা বাগধারায় শব্দটির বিশেষ বা রূপকার্থে ব্যবহারের উদাহরণ সহ সংজ্ঞার্থ ;

চ. ক্ষেত্র বিশেষে শব্দটির সমার্থক বা/এবং বিপরীতার্থক শব্দের নির্দেশ।

ঢাকার বাংলা একাডেমি কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত গোলাম মুরশিদ-এর বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কীভাবে আরো এগিয়ে যাওয়া যায় এই ব্যাপারে (বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও সারা পৃথিবীর) বাংলাভাষী বাঙালিদের কি কিছুই করার নেই?

প্রশ্ন ১৬.

বাংলাভাষার শব্দের বানানের ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য। ঢাকার বাংলা একাডেমি আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান ব্যাপারে একমত নয়। একাডেমি, আকাদেমি – এই দুই বানানেই বোঝা যায় মতভেদের কারণ খুব গভীর নয়। এছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকা বা আরও কিছু প্রকাশন-সংস্থা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের নিজের বানানবিধি মেনে চলে। দুদেশের একাডেমি, ত্রিপুরা, আসাম ও সারা পৃথিবীর বাঙালিদের যোগাযোগ, আলোচনা ও সম্মতির মাধ্যমে বাংলাভাষার শব্দের বানানে একটি অদ্বিতীয় বিধান রচনা করুক এটা কী দাবি করা যায় না ?

প্রশ্ন ১৭.

কিছুদিন আগে প্রদীপ বসু নামে খ্যাতনামা ইতিহাস-সমাজতত্ত্বের গবেষক-অধ্যাপকের লেখা দুটো প্রবন্ধ চোখে পড়ল। তাঁর মতে বাংলাভাষায় জ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তার প্রধান কারণ হল ভাষিক উপাদানের অর্থাৎ পরিভাষার অভাব। বার বার গুরুগম্ভীর জ্ঞানীদের মুখে এই যুক্তি শুনে বাঙালিরা ভয়ে-ভক্তিতে নতমস্তকে তা মেনে নিয়েছি। কিন্তু সৎশিক্ষার অনটনে পূজ্যপাদ তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রতি সনাতন ভক্তি আর বিশ্বাসের অভাবে দুর্বিনীত আমার কুতর্ক করার নিন্দনীয় স্বভাব থেকে আমার মনে হল, আসলে কোনো ভাষায় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষা তৈরি হয়। দৃষ্টান্ত দেখা যাক Algebra (আরবি আল-জাবর থেকে চতুর্দশ শতকে ল্যাটিনে তারপর ইংরেজি সহ আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিতে রূপান্তরিত), television (বিশ শতকের শুরুতে গ্রিকমূল তিলে (τῆλε দূরে) ও ল্যাটিনমূল vision (দৃশ্য), ১৯২০-র পর ইংরেজি সহ আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিতে রূপান্তরিতভাবে আধুনিক দূরদর্শন । দুটি শব্দই আদিতে নতুন পারিভাষিক শব্দ। প্রয়োজনে গঠিত আর গৃহীত হয়ে ব্যবহারের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় প্রাত্যহিক শব্দে পরিণত হয়েছে। বাংলাভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় একই ভাবে গ্রিক ও ল্যাটিনের মতো সংস্কৃত বা/এবং বিদেশি আরবি-ফার্সি থেকে গঠিত আর রূপান্তরিত শব্দ পারিভাষিক শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়ে ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রাত্যহিক শব্দে পরিণত হতে পারত। ধরা যাক email , বিভিন্ন আকার আর নামে বৈদ্যুতিন চিঠি বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে চালু হলেও বর্তমান নাম ও পদ্ধতিতে email বা e-mail চালু হয় বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে। নামটির গঠন দেখে (Electronic + Mail) অল্পশিক্ষিত আমার মনে হল বাংলায় আমরা বৈচিঠি বা বৈ-চিঠি (বৈদ্যুতিন চিঠি) চালু করতে পারি, কিন্তু আমার ‘শিক্ষিত’ বন্ধুরা হাসল, একজন আমাকে উদ্দেশ করে বাংলায় ‘ছিটিয়াল’, আরেকজন ইংরেজিতে ‘ক্র্যাকপট’, তৃতীয় জন অবোধ্য কোনো ভাষায় ‘কোঁপ্লেৎমঁ দ্যাঁগ’ বলে অন্য কথা পাড়ল । তবু আমার মনে হয়, খোদ ইংল্যান্ডে বা ইয়োরোপে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যদি বেশ কিছু প্রদীপ বসু আর আমার বন্ধুদের মতো ‘শিক্ষিত’ থাকত তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সাধারণ মানুষের অবোধ্য ল্যাটিন আজও বেঁচে থাকত, জীবনচর্যার সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো সংযোগ স্থাপিত হত না। ইয়োরোপে চিন্তার মধ্যযুগ কাটত না। আমার প্রশ্ন বাংলা ভাষায় কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সম্ভব নয়? জাপানিতে, কোরিয়ানে, চিনে, (ইন্দোনেশীয়) ভাষায়, থাই, আরবি, রুমানিয়ান, পোলিশ, হাঙ্গেরিয়ান, চেক ইত্যাদি ভাষায় যদি তা সম্ভব হয় তাহলে বাংলায় কেন সম্ভব নয়? প্রদীপ

বসুর মতো বিদগ্ধ বাঙালিরা কী বলেন?

প্রশ্ন ১৮.

১৮৬৫ সালের ২৬-এ জানুয়ারি ফ্রান্সের ভের্সাই থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বন্ধু গৌরদাস বসাককে একটা চিঠিতে লিখছেন:

...European scholarship is good…but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those, who feel that they have spring of fresh thought in them, fly to their mother-tongue…I should scorn the pretensions of that man to be called *"educated"* who is not master of his own language.

[ইয়োরোপ বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয় ব্যাপার, … কিন্তু আমরা যখন পৃথিবীকে কিছু বলব তখন তা যেন আমরা আমাদের নিজের ভাষায় বলি। নিজেদের ভেতরে নতুন চিন্তার উৎসার রয়েছে বলে যারা বোধ করে তারা যেন অবিলম্বে নিজেদের মাতৃভাষার ছুটে যায়।... নিজের ভাষায় দক্ষতা নেই এমন কোনো মানুষের 'শিক্ষিত' বলে পরিচিত হতে চাওয়ার ভড়ংকে আমি ঘৃণা করি।]

ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে ১৮৯১ সালের সমাবর্তন অভিভাষণে বলেন:

I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own vernaculars. Consider the lesson that the past teaches. The darkness of the Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of Knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So in India... the dark depth of ignorance all round will never be illumined until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars. (Convocation Address 1891)

[আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষাগুলির মাধ্যমে জ্ঞান প্রচারিত না হলে জাতি হিসেবে আমাদের কোনো সর্বব্যাপ্ত আর পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। অতীত আমাদের যে শিক্ষা দেয় তার কথা ভেবে দেখুন। অসংখ্য আধুনিক ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো দীপ্তিময় হয়ে ওঠার আগে অব্দি ইয়োরোপে মধ্যযুগের অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য... তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো জনসাধারণের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত চারপাশের অজ্ঞানের গভীর অন্ধকার কখনোই আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। (সমাবর্তন অভিভাষণ,১৮৯১)]

১৯১২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাসায়াণিক পরিভাষা পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় বহুল পরিমাণে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত না হইলে পরিভাষার দোষগুণ সম্যকরূপে বিচার করা যাইতে পারে না। গ্রন্থকারগণ কতক শব্দ গ্রহণ করিবেন, কতক বাদ দিবেন, কতক বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন। এক কথায়, বাঙ্গালী মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার না করিলে কখনই ভাষার ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের

পুষ্টিসাধন হইবে না।'

১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই ? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে ? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে , শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে ,– কিংবা সে আগাছাও নয় যে , মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হাওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কুলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।' (রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষার বাহন)।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে 'যাঁরা বলেন বাংলায় বিজ্ঞান চর্চ্চা সম্ভব নয় তাঁরা হয় বাংলা জানেন না অথবা বিজ্ঞান বোঝেন না।'

মধুসূদন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু - এঁরা কী তাহলে সত্যিকারের শিক্ষাদীক্ষার ঘাটতি থেকে উলটো-পালটা বকেছেন, অথবা ওঁদের উক্তি নিতান্তই পাগলে কী না বলে! রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রিয় 'শিক্ষিত' বাঙালিরা কী বলেন? এছাড়া বাঙালি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আরো অনেকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্মন্ধে যা ভেবেছিলেন তা নিয়ে বাঙালিরা আর মাথা ঘামাল না কেন ?

প্রশ্ন ১৯.

১৮৩৫ সাধারণ অব্দে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাবের ষাট বছর পর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম' (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০২/ জুলাই-অগাস্ট ১৮৯৫ সাধারণ অব্দ) নামক প্রবন্ধে লেখেন:

'ষাটি বৎসর পূর্বে এ দেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না...

আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে হয় ও কিরূপে শিখিতে হয় তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই। মনুষ্যজাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্ত্তৃক এক কাঠা, কি এক ছটাক পরিমানেও বিস্তার লাভ করে নাই।...

আমরা ইংরাজের প্রসাদে শিখিয়াছি যথেষ্ট...কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার শক্তি কই, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নূতন কথা কি বলিলাম!...

ষাটি বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই, আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের শক্তি বাড়ে নাই: আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি, কিন্তু স্বয়ং বাক্য রচনা করিতে জানি না। আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হীন, আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ।...'

মেকলের প্রস্তাবের ষাট বছর পর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যা বলেছিলেন তা রামেন্দ্রসুন্দরের বলার একশ ন বছর পর আজ পড়ে আজকের 'শিক্ষিত' বাঙালির কী মনে হয়? আজও কি কথাগুলো একই ভাবে সত্যি?